প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীজীবনকুমার বসু
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫।এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : এস. সাহা
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স : ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপট ও টাইটেল : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত
বাঁধাই : বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯

সূচী

আমি তো পাথর—তুমি জানো

কবি বসেছেন চক্রে সপার্ষদ পোর্টিকোর পাশে
ঘাসে, ভর সন্ধেবেলা, চারদিকে বিলিতি সাবুগাছ,
আলাপচারিতা কোনো স্থিরবৃত্তে ঘোরেনি এখনো,
ছিটকাপড়ের মতো কথা ভাসে এখনো হাওয়ায় ।
হাওয়ায় রয়েছে হিম, গতকাল স্মৃতিপলাতকা,
আজ সন্ধ্যা কোনভাবে সে-স্মৃতিকে স্বাগত জানাবে ?
পাঁচিলের বাইরে রাস্তা, কিছু গাড়ি আসা-যাওয়া করে ।
সে-মুহূর্তে একটি গাড়ি গেট দিয়ে পোর্টিকোর পাশে
এসে দাঁড়িয়েছে, যারা নামলো, তারা নেমে কাছে আসে—
তখনি সুস্পষ্ট হলো শান্তি আর সঙ্গে দুটি নারী
এক নারী শান্তির পত্নী, অন্যজন ? স্বপ্ন মনে হয়
সুদেষ্ণা এসেছে এই চক্রের মাঝখানে :
হাতে রুলি, কানে টব, গলায় চিকন সরু হারে
সুদেষ্ণা এখনো যেন স্থগিত কিশোরী
নমস্কার ক'রে বসে, ট্যাক্সি চলে যায়···
চক্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ, শান্তি কথা বলে
বলে, তোর বাড়ি গিয়ে শুনলাম এখানে
হয়তো আছিস, তাই সদলে এলাম ।
ভালোই তো করেছিস, একটু পান কর
কথা বলছি তারপর, সুদেষ্ণা কেমন ?
ঠিক আছি, ও অসুস্থ, তাই কলকাতায়
তিনদিন এসেছি,
তুলনায় ভালো বলে আজ বেরিয়েছি
যদি দেখা করতে পারি, খবরটা জানাবো ।
শান্তিকে পাঠাতে পারতে, তুমি এলে কেন,
চক্রের সৌভাগ্য খুবই, চক্র ধন্য হলো ;
কী অসুখে মনোতোষকে টেনে আনতে হলো
এতোদূর, সে কথা বলেনি কিন্তু, শান্তি তুই বল ।
ভয়ংকর দুর্ঘটনা, শরীর তছনছ, হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে
বাঁচাই কঠিন, তাই শেষ চেষ্টা করতে কলকাতায় ।
সে কি কথা ? কোথা আছে ? পিজিতে ? এখুনি চল্ যাই ।
আজ গিয়ে লাভ নেই, আমরা ঘুরে তোর ওখানে গেছি
সুতরাং, যা কিছু কর্তব্যকর্ম কাল করিস.
তোর চেনাশুনো বিশ-পঁচিশ সার্জেন বন্ধু, গুরুত্ব বোঝাস

সুদেষ্ণা অনাথ হয়ে যাবে…

নিমডির টিলায় বাংলো, তারপর ব্যাপক প্রান্তর।
প্রান্তরের শেষে পথ, ডাইনে রোরো নদী,
বাঁয়ে গেলে মধুটোলা, সুদেষ্ণার বাড়ি,
সকালে বিকালে দেখা এবং সন্ধ্যায়
দেখে কথা বলে আর পিপাসা মেটে না
বালকবয়সী মন কী যে চায় জানে না নিশ্চিত,
জানে না বলেই করে পদ্যে প্রকাশিত,
কী অসংখ্য পদ্যাপদ্য তাকে যে সুদেষ্ণা দিয়ে গেছে !

তখন টাটায় থাকতো : বিবাহের পর সুদেষ্ণা ও মনোতোষ।
দুদিনের জন্যে গেছি চাইবাসা সফরে,
একদিন জঙ্গলে গেছে শালসেগুনের,
অন্যদিন হাতে।
হঠাৎ সমীর বললো, চল তেল ভরি গাড়িতে এবং যাই সোজা
জামশেদপুর
কালকে ওখান থেকে তুই ফিরে যাবি,
আমরা ফিরবো চাইবাসায়।
বিকেলে প্রস্তুত গাড়ি, হাট থেকে মাছ তুলে নেওয়া হলো আর দু
বোতল রাম
সুদেষ্ণা খিচুড়ি খাবো, মাছ ভেজে দাও।
ঘরে নয়, রাম নিয়ে ছাদে যাওয়া, ছাদে চক্রে বসা
ঘরে পুজো-আচ্চা করে মনোতোষ, তাই ঘরে নয়,
সুদেষ্ণা ও মনোতোষ পাশাপাশি বসে, বলে, গান করো একাধিক
কিছুক্ষণ বাদে আর গান তো করবে না
তোমার পুরনো গান আজো মনে পড়ে।
রাত বারোটায় নিচে খেতে আসা, গান
গান ভাঙ্গে প্লাস্টার, পুরনো স্মৃতি, বাল্যকাল আর
প্রথম চুম্বন অন্ধকারে, বন্ধ দরোজার পাশে, সুতীব্র উচ্ছ্বাসে
একটি চুম্বনে এক শতাব্দী সহজে ভেসে যায় !

তারপর দেখা হলো দুবছর বাদে
সভাপতি হয়ে টাটাবাবার শহরে—
সে-রাত হোটেলে থাকবো, রাতে ভোজসভা,
সে সব নিষিদ্ধ করে মনোতোষ-জুড়ি

আমায় চারহাতে টেনে নিয়ে চললো গাড়ির ভিতরে।
ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে অন্তত দুদিন,
একদিন দলমায় যাবো, অন্যদিন ছুটি ;
ছুটিতে চারবেলা খাওয়া এবং বিশ্রাম
কলকাতা শহরে যেন বিশ্রামের কমতি আছে ওরা মনে করে !
গাড়ি যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে পথে।
কমলকে তুলে নেবো আর বিষ সুদেষ্ণা নিয়েছে।
আমি ঢেলে দেবো আজ, তুমি কম খাবে
কমল যা ইচ্ছা খাক, ও তো বাচ্চা ছেলে :
তোমার বয়েস হচ্ছে মনেই রাখো না,
কমলও কালকে যাবে একসঙ্গে দলমায়।
যদি হাতি দেখতে পাই, কী দারুণ হবে—
সুদেষ্ণা এখনো মজা সব কিছুতে পায় !

দলমার পাহাড়ি বাংলো, দোতলায় ঘর
সামনে সুবর্ণ যায় এঁকেবেঁকে গাঢ় সমতলে।
জঙ্গলে ময়ূর ডাকে, বাগানে উত্তাল প্রজাপতি,
আমরা বারান্দায়⋯
সন্ধ্যা নেমে আসে পায়ে পায়ে।
সুখ শীত নেমে আসে খরগোশের গায়ে
রাত বাড়ে
সুদেষ্ণা চঞ্চল।
মনোতোষ কমল কিছুক্ষণ হলো গেছে বাংলোর বাহিরে
মহুয়ার খোঁজে।
বারান্দায় সুদেষ্ণা একা, আমি একা, একথালা চাঁদ
মাথার উপরে ;
সুদেষ্ণা বলে, আজো ভালোবাসো ?
বাসি, তা, প্রকৃতি অন্য, তুমি ?

আমি ভয় পাই, ভয় পাই, ভালোবাসি, তুমি তো পাথর।
একদিন পাথর ফেটে জল ছুটেছিল—
তা ঠিক, সেদিন আমি ভয়ে পালিয়েছি,
আজ মনে হয় আমি ভুলই করেছি তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে
কিন্তু এইই ভালো, মাঝেমাঝে মনে হয়, যাই দেখে আসি
তোমার নিকটে যাই, কিছুদিন থাকি, মনোতোষ সব জানে
সমস্ত বলেছি,

ওকে ফাঁকি দিতে বড় কষ্ট পাই মনে, ও আমাকে ভালোবাসে।
আমার জন্যেই, ও তোমাকে ভালোবাসে, ভক্তিশ্রদ্ধা করে।
মন্দ কী, ব্যবস্থা ভালো, এভাবেই যাক
কেটে একজীবন !

কিছুই যায়নি করা, মনোতোষ মৃত, সুদেষ্ণা বিধবা হয়ে আছে চার বছর
এবার চাইবাসা গেছি, দুদণ্ডের জন্যে গেছি সুদেষ্ণার কাছে,
বড় ব্যস্ত, মেঘাতুবুরুতে যাবো একঘণ্টা পরে,
সুদেষ্ণা ভর্ৎসনা করে. একদিনও গেলে না, ও তোমায় দেখতে চেয়েছিলো
অমন চেহারা আমি সইতে পারবো না ভেবে যাওয়া হয়নি আর
অসম্ভব ছিলো বাঁচা ডাক্তার বলেছে, তাই যাইনি, গেলে কষ্ট হতো,
আমি তো পাথর, তুমি জানো।

পাতা ও ফুলের গল্প

বাগানে ফুলের চেয়ে পাতা খুবই
অবশ্যম্ভাবী।
পাতার প্রেক্ষিতে ফোটে ফুলগুলি
ভালো-মন্দে মেশা,
কিন্তু, পাতা জেগে থাকে, বাগিচা
বিস্তৃত করে রাখে—
আক্রমণ হবে বলে কোনোদিন
ফলের, বীজের।
মাতৃসমা পাতা যদি তুমুল বিস্তার
নিয়ে আসে—
আমার আনন্দ হয়, আমি দেখি
রূপসী বাগিচা!
সবুজের রকমারি আস্ফালন দেখে
হিংসা হয়,
ফুল তো মানুষ হয়ে জেগে থাকে
সমাজে, সংসারে ॥

সহজ

এতো কঠিন পাথর ভেঙে করলে
তুমি সহজ নদী
তোমার হাতে যাদুদণ্ড—সুসময়ের
সঙ্গে আসো ।
সঙ্গে চলো : এই কথাটি তুমি আমায়
বললে যদি—
তোমার সঙ্গে আকাশ-পাতাল ;
বললে, আজো ভালোই বাসো !

কতোকালের ইচ্ছে ছিলো তোমার
সঙ্গে কইবো কথা—
উজ্জ্বলতাব স্মারক বাগান, সেই
একদা দেখিয়েছিলাম !
আজ বিকেলের আলোয় বুঝবো
অবশ্যাত নীরবতার
জন্ম ক্ষণেক, বাড়তে থাকলো. আমরা
দুজন বসেছিলাম ।

জনসভার মধ্যে এমন একাকিত্ব
কখনো হয় !
একা একাই ছিলাম বসে. কয়েক বছব
বসেই আছি ।
তোমার মুখে হঠাৎ দেখি
স্কাইলাইটের রোদ পড়েছে—
পিছিয়ে গেলে কিশোরবেলার একটি
পাল্লা খোলার পাশে !

বলেছি তো সঙ্গে যাবো. তোমার
বাড়ি আসবো দেখে.
সঠিক সময় গিয়ে আমরা দুচার চুমুক
কফি খাবো ।

হে দেবদারুর বিস্তার

হে দেবদারুর বিস্তার—আমি শুনতে
পাচ্ছি
তোমার মধ্যে ভাঙছে ঢেউ, আলো
খেলছে অলস,
নির্জন ঘণ্টা বাজছে।
খেলার পুতুল, তোমার চোখে
গোধূলি নেমেছে
গোধূলি পৃথিবীতে, তোমার মধ্যে
ভুবন গান গেয়ে উঠছে।

তোমার ভিতরে আছে নদী ও তার
গান, তোমার ইচ্ছেয় আমি
ওদের দিকে ছুটে যাই। তারপর তুমি
যা করবার করো।
তোমার দিকে তাক করা ধনুক, হঠাৎ
কখন
একঝাঁক তীর তোমার দিকে পাঠিয়ে দেবো।

আমার সবদিকেই দেখছি তোমার
কুয়াশার কটিদেশ
তোমার নীরব আমায় ব্যতিব্যস্ত করে
তল পায় আমার আদর চুমু, আর
ভেজা ভেজা কেমনধারা
বাসনার ঠাঁই তুমি, তোমার আলিঙ্গন
দুই বাহুর
স্বচ্ছ পাথরের।

হে তোমার কিন্নর কণ্ঠ, যাতে
ভালোবাসা রিনরিনিয়ে বাজে—
মরো-মরো সন্ধেব বুকে তার অন্ধকার প্রতিধ্বনি!
এভাবেই, কোনো গভীর গূঢ় সময়ে,
মাথা তুলে প্রান্তরে দেখেছি—
বাতাসের মুখের ভিতর কীভাবে
শস্যের কান পূর্ণ হয়ে ওঠে।

গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে—
প্রতি গাছে জল দিই, ফুল দেয়
পরিবর্তে গাছ !
এই দেওয়া-নেওয়া চলে অনুচ্চারিত
মৃদু প্রেমে,
গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম, আর
কেউ নয় ।
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে ॥
সকলেই গাছ নয়, কিছু কিছু
আগাছাও আছে,
তাদের নিড়ুনি দিয়ে তুলতে হয়, গাছ
সুখে থাকে,
সুখে থাকবে বলে গাছ অবহেলে
ওদের দেখায়—
আগাছাও তুলে ফেলতে কষ্ট হয়,
তারও ফুল আছে ।
হয়তো কৌলীন্য নেই সূর্যমুখী বেলির
মতন,
তবুও তো সে ভালোবেসে আমাদের
বাগানে বসেছে !
জল বিনা দিচ্ছে ফুল বহু রঙে নানান
আকারে—
সুখে থাকবে ভালো থাকবে বলে
গাছ, তাকে তুলতে হয়,
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি, গাছ
কথা বলে ॥

কিশোরবেলার ঘুম ভেঙে

কিশোরবেলার ঘুম ভেঙে গেছে
হঠাৎ সন্ধ্যায়,
তোমাকে সহস্র নামে ডেকেছি
সন্ধ্যায়,
ধরেছি ও-মুখসাজ করতলে, চুম্বন
করেছি,
সেই স্মৃতি মনে করে হয়েছি পাগল ।
হয়েছি অশ্বের মতো তেজী আর
স্বেদেও ডাগর,
ধরেছি তোমার দুটি স্তন এক কঠিন
আবেগে—
কিশোরবেলার এক থরোথরো
যন্ত্রণার জ্বরে
কয়েক দশক পরে, এই ঘোর, এই
আলিঙ্গন !

তোমার মুখের পরে মুখস্থাপন করে
বলি :
তুমি মোর যুঁইগন্ধ, তুমি চামেলির
মাংসভুক ।
তোমার চুলের ছটা অন্ধ করে দিয়েছে
আমাকে,
জিভের বর্ষায় আমি ভিজে গেছি

চলো এ-শহর ছেড়ে দূরে যাই, ঘাটের
রানায়
পা ছড়িয়ে বসবে তুমি, আমি পা
চুম্বন করে যাবো ।

ধর্মের সোপানগুলি কাঁদে

ভক্তের পায়ের স্পর্শে ধর্মের
সোপানগুলি কাঁদে !
প্রতিমা একাকী থাকতে
চায়—কোনো ভক্তই বোঝে না,
কবিত্ব-অসুখে ভুগে প্রতিমা একাকী
থাকতে চায় ;
অন্তত একদিন ওকে ছুটি দাও, ও
ভক্তমণ্ডলী—
ভক্তের পায়ের স্পর্শে ধর্মের
সোপানগুলি কাঁদে !

স্থানান্তরিত করো প্রতিমাকে এক
রহস্যালোকে ।
কিছুক্ষণ আয়ু দাও কিশোরীর,
আনমনা হোক,
নিজেকে সাজাবে ব'লে তুলে আনুক
কুর্চি, পদ্মনাল—
এক কোঁচড় ফুল তুলে গাঁথুক একান্ত
মালাখানি ।

তোমার মালাতে কেন প্রতিদিন ওর
ক্ষুধা মেটাবে ?
স্বকৃত মালায় সেজে রাজেন্দ্রাণী
জঙ্গলে দাঁড়াক ।
কপোল চুম্বন করবো, চন্দন পরাবো
দুই হাতে—
একবার মানুষী হয়ে নামতে দাও
ধর্মের উঠোনে,
ভক্তের পায়ের স্পর্শে ধর্মের
সোপানগুলি কাঁদে !

হলুদ অসুখে

বারান্দার পাশাপাশি ঘর থেকে
আমাকে
বিদায় করেছে ঘর, এখন বাহিরে,
বারান্দায় ঝরে পড়ে হলুদ অসুখ।
এ-অসুখে সূর্যালোক অত্যন্ত জরুরী।
সারারাত জ্বর হয়, অসহ্য কামড়
গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, হাড়ে,
মজ্জায় মজ্জায়,
মাথার ভিতর শ্রান্তি কাটে ঘুনপোকা,
সে যে কী অসহ্য শব্দ কানে এসে
লাগে !
ঘুমঘোরে পড়ে থাকি হলুদ বিছনায়।
যেখানে পা ফেলি, দেখি, হলুদের
গুঁড়ো,
পরিপার্শ্বে হলুদের ছায়া পড়ে
আছে—
যেদিকে দু' চোখ যায় হলুদ, হলুদ !

বিজয়া দশমী বড় শারীরিক

তিনটি দেয়ালগিরি, ভূমধ্যে কার্পেট,
কণ্ঠে, তার যে দিন ভেসে গেছে আর
পিপাসা নাই মিটিল...
বাইরে ঝমঝমিয়ে এলো বৃষ্টি আজ বিজয়া দশমী
গ্রহণ না বিসর্জন ঠিক করতে হবে ।
না বাজে ঢাকের বাদ্যি, বাজে না কাঁসর,
শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি পিচ থেকে মরামে :
অদূরে খোয়াই, ঝিল
প্যাঁকপেকিয়ে চলে হাঁস ঝিলের মাঝখানে,
উদয়নে
কদম্ব ছড়িয়ে আছে, কেশর পড়েছে,
সোনাঝুরি ফুটে আছে ক্যানেলের পাশে,
বনতুলসীর ঝোপে অবাধ্য টুনটুনি,
গাছের পাতার মধ্যে লুকিয়েছে জোনাকির আলো—
ভয়ঙ্কর মধ্যরাত, সিকিমের সুরা
গ্রহণের গন্ধ তার সমস্ত শরীরে
নতুন কাপড় তার সমস্ত শরীরে,
কেন এতো শারীরিক বিজয়া দশমী ?
মাঝেমধ্যে সুরাপান, মাঝেমধ্যে গান
গানের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া অতীত-সর্বস্ব
সেদিনের মধ্যে, দেখা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে
'কিছুই বদলায়নি, তুমি, তেমনই রয়েছো'
'বয়েস হয়েছে, দ্যাখো উচ্ছ্বাস করো না'
একমাথা সুগন্ধ নিয়ে বুকে পড়েছিলে,
দম বন্ধ হয়ে আসে সে-মাথা চুম্বনে—
মুখশ্রী দূরেই থাক, আজ বিসর্জন,
বিসর্জনে এতো পাওয়া, অনেকটাই পাওয়া
বিসর্জনে সবকিছু যেতে দিতে হয় !

২

জলাপাহাড়ের বাংলো, অতিপ্রাকৃতিক
টিলার উপর বসে আছে,
সামনে পিছনে ঝাউ, দুপাশেও ঝাউ—
তার মধ্যে টালি খোলা—বাংলো এক দৃশ্যের মতন ।
আমি কিছুদিন, হাতে, বান্ধবের কাছে

বেড়াতে গিয়েছি শীতে অক্টোবর শেষে এক পুজোর ছুটিতে
আজ থেকে বহু আগে যুবক বয়সে
সে হবে বসন্ত শেষ, হেমন্তের শুরু,
বিজয়া দশমী !
সকালে নেমেছি ম্যাল-এ,
ইতি-উতি গেছি
আপ্যায়িত করবে বলে কয়েক সুজনে
আমার বান্ধব করে গাঢ় নিমন্ত্রণ :
সন্ধেবেলা পানভোজন, আপনারা আসবেন
নামিয়ে দেবার সব ব্যবস্থা আমার
এ-বছর শীত বড় জব্বর পাহাড়ে
কিছুদিন আগে বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে
রোদ্দুরে কাঞ্চনজঙ্ঘা সে কী মোহময় !
বিজয়া দশমী শুরু করেছি দুপুরে
জিন লেবু সোডা সে যে অমৃত সমান,
বান্ধব সামান্য দিয়ে আচমন সেরেছে,
আমি খেয়ে দেখতে যাচ্ছি পূর্ণাঙ্গ টেবিল,
বন্ধুপত্নী এক ঝুড়ি কমলা রেখেছে,
আমি সে কমলা ছেনে জিনের সহিত
কমলারঙের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছি বাহিরে—
বাংলোর সামনে লনে ছাতার তলায় ।
শীতে ও তৃষ্ণায় পান করে যাচ্ছি, বিকেল গড়ায়
অদূর সন্ধের দিকে, উঠে পড়তে হয়,
অন্তত দুঘণ্টা চাই নিশ্ছিদ্র বিশ্রাম
পরবর্তী খেলা শুরু সন্ধে এসে গেলে…
বাতাস বয়েছে বেগে
শীতের পশম ভিজে-ভিজে হয়ে ওঠে
একে একে অতিথিরা…
ফায়ার প্লেসে জ্বলন্ত আগুন
কাঠ থেকে রস বেরোয়, গড়ায় মেঝেতে
অনিরুদ্ধ নিয়ে আসে কাকলিকে সঙ্গে করে হঠাৎ সন্ধ্যায়
বিশ বছর বাদে আমি কাকলি দেখলাম ।
কী করো, কেমন আছো, এন পি তো কিছুই বলেনি
এন পিই বলেছে, তুমি কদিনের জন্যে এসে গেছো
আছো কিছুদিন ?
আছি, আছি—থাকতে লাগছে ভালো ।

তোমার বাড়িতে যাবো, দার্জিলিং-এ কোথা আছো তুমি ?
এন পি জানেন সব, বাড়িতে নিয়ে আসতে বলবো একদিন
কী খাও, কতটা খাও আজকাল, খাওয়া কমিয়েছো ?
কমাতে কেন যে যাবো, বিয়েও করিনি !
তা জানি, বয়েস হচ্ছে, অনিরুদ্ধ কমিয়ে দিয়েছে,
অনি আর খেতো কবে ? পাল্লায় পড়ে বেশি খেতো—
তবু, ও তো কমিয়েছে
ওর জন্যে তুমি আছো, তাই কমিয়েছে
এখনো তোমার জন্যে আমি আছি নিত্যশুভার্থিনী
তা তো ঠিকই, সেজন্যে এখনো—
দেখা হলে ভালো লাগে, অগ্নিস্পৃষ্ট হই
সে সবই কথার কথা, দেখা হলে বলতে হয় বলে বলছো
অনিরুদ্ধ কই ?
আছে কোথা ভিড়ে-ভাড়ে, অস্বস্তি আমাকে ?
চলো না বাইরে যাই, দুপুরে তো ওখানে ছিলুম,
চারিদিকে আলো জ্বলছে, লনে আরও বহু ছাতা পাতা
তার তলায় অল্পস্বল্প মানুষও রয়েছে,
বিজয়া দশমী বড় শারীরিক বলে মনে হয়
চুম্বন করোনি বহুদিন, তাই করে দেখবে নাকি
কী লাভ, চুম্বন থাক, তুমি শুধু কাছাকাছি থেকো—
তাও শারীরিক হবে,
বিজয়া দশমী বড় শারীরিক, জানো !

৩

নির্মডির বাসা থেকে মধুটোলা খুব দূরে নয়,
মাঝখানে প্রান্তর জুড়ে শুধুমাত্র এবড়োখেবড়ো টিলা ।
এ প্রান্তে বাজার, অন্য প্রান্ত জুড়ে বয় রোরো নদী,
দূরে লুপুংগুটু ঝর্না, অর্জুনের দীর্ঘ ছায়া মাখা,
শীতে বনভোজন করে স্কুলছেলেমেয়ে ।
নিমডিতে আমরা থাকি—আমি ও সমীর
আমি মাঝেমধ্যে আসি কলকাতা কমলালয় ছেড়ে
চাইবাসা থেকে বের হয়ে যাই ঝোলাঝুলি নিয়ে,
টেবো যাই, রোগতে কখনো, হেসাডি বা ধদগাঁও-এ
দুদশদিন ঘুরে আসি সিংভূমজঙ্গলে ।
ঝর্না দেখি, সেগুনমঞ্জরী, শালপলাশ, তীব্র ফলগুলি মহুয়ার
মহুয়ায় স্নান করি দিনরাত ভালুকের মতো
আকণ্ঠ মহুয়ায় যেন জ্বর আসে ভালুকেব মতো

দেখেছি অনেক বাঘ, সাপ আমি সিংভূমজঙ্গলে,
মানুষকে ভালোবেসে মানুষের কাছে থাকতে চায়
ভালোবাসে না যে কেন শীলা নাম্নী অক্ষত কিশোরী !
একদিন ভালোবাসলে দশদিন থাকি,
চাইবাসা ছেড়ে আর কোনোদিন যাবো না কোথাও—
বিজয়া দশমী কেন এতো শারীরিক ?
নিমডির বাসায় পেয়ে বারান্দায় আমি জড়িয়ে ধরেছি
এরই প্রতীক্ষায় ছিলো যেন বা সে এতো দীর্ঘকাল,
তুমি বুঝি মদ খেয়েছো ? সেজন্যে এমন ব্যবহার,
মনে মনে বলি, আমি খাইনি, আকণ্ঠ মদ খাবো
তার আগে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ গিলে খাবো
তবেই আমার শান্তি !
আজও দেখা হয় তার সঙ্গে এ-বৃদ্ধবয়েসে
সেদিনের ঘটনা নিয়ে দুজনেই হাসাহাসি করি
কী কাঁচা ছিলাম আমরা সে সময়ে
বিজয়া দশমী বড় বিশ্বাসযোগ্য শুধু বিসর্জনে ॥

আশ্চর্য নতুনভাবে দেখা হয়েছিলো

কবরখানার থেকে হিমঘুম জাপটেছে সড়ক ।
এখন দুপুর, রোদ-জ্বালা ধুন্ধুমার কাণ্ড করে
পিছলে যায় ট্যাক্সি-গাড়ি, চোখ মুদেছিনু কেন ভুলে ?
খুলে হাহাকার, ওকে বাম থেকে ডানে যেতে দেখি,
হঠাৎ সুমুখ দিয়ে পার হয়ে ওপারে সারস
চোখ তুলে, তন্মুহূর্তে দৃষ্টি রাখে পথের উপর
সন্তর্পণ, গ্রাহ্যাগ্রাহ্য মনে করে গাড়ির ভিতরে,
কিশোর সিঁড়ির দিকে ধেয়ে যাই নেবুবাগানের
গলিতে, গালের 'পরে গন্ধ পাই দুধের সরের
দু আঙুলে ঘষে তোলো রাতের আলস্য, নাকি ঘোর
ঘুমের, স্বপ্নের মোম ! তুলে ফেলো অবিমৃশ্যকারী
হাওয়া, যা তোমাকে ছোঁয়, সেবার সকালে ছুঁয়েছিলো ।
তারপর দীর্ঘদিন গেছে ।
বালুর উপরে এসে দাগ রেখে জলের বছর
এখানে-ওখানে গেছে । মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়েছে
ক্ষতি নেই । দেখা হয়েছিলো ।
আশ্চর্য নতুনভাবে দেখা হয়েছিলো, বারবার,
মনে আছে ।

মানুষ যেভাবে দেয়

না, কোনও অরণ্য থেকে নয়, একটি গৃহকোণ থেকে
কাঠুরে কুঠার কাঁধে বেরিয়ে এসে শিরীষ-আড়ালে
নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। অধিকন্তু, লুকালো কুঠার।
কারণ, মুহূর্ত আগে করেছে সে জীবন-হরণ—
দীর্ঘ দেবদারু কেটে, হতভম্ব, পাথর হয়েছে।
আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে ক্রোধ, শোক, মূর্ছা, হেরে-যাওয়া
মানুষের, মূঢ় মুখ, মতিচ্ছন্ন অথচ সংযত
এই চলে-যেতে-দেওয়া, ঘর ছেড়ে ঘরের বাহিরে।

মানুষ এভাবে দেয় কোলে তুলে নিজের শিশুকে
দিতে হবে বলে দেয়, রক্তে হুলস্থুল হলে দেয়,
না দিয়ে পারে না বলে দিয়ে দেয় বুক থেকে ছিঁড়ে,
বাগান তছনছ করে দিয়ে দেয় ফুলের দ্যোতনা
দুহাতে অঞ্জলি দেয়, অশ্রুপাতে সন্ন্যাস মিশিয়ে
মানুষ যেভাবে দেয়, সেভাবে দেয় না পশুপাখি।

অত্যাগসহন

শেষ খবরের আগে, কীভাবে জানলার পাশে এসে গিয়েছিলে
একা, শয্যাত্যাগ করে, নিরঙ্কুশ একা !
জেনে নিতে এসেছিলে দুঃখে-সুখে কোন ভাবে আছি ।

ভালো নেই, শুনে, আমি বহুবার, বহুভাবে গেছি—
দেখতে পারবো না বলে ফিরেছি মূঢ়ের মতো ঘরে ।
জীবিতের সঙ্গে দেখা আমার হলো না, ভাগ্যহীন !

ঊষা বা গভীর রাত কঠিন খবর শোনাবেই—
তৈরি আছি, কোনোমতে, সহ্য করে আছি,
প্রস্তুত রেখেছি কান, কণ্ঠরোধ করেছি ক্রন্দনে···
চৈত্রশেষ, বৃষ্টি নামবে বৈশাখে, সন্ধ্যায়
চোখের আড়ালে জল জলে গিয়ে মেশে !

প্রয়াত মুখশ্রী রেখে ফুলের বন্ধনে
তুমি গেলে অনায়াস, ভিক্ষা দিয়ে গেলে
স্মৃতি অবিনাশী আর ভালোবাসা মাধবের মতো ।
দেবতা কিন্নর পাও, মনে রেখো মানুষের কথা
অত্যাগসহন, তুমি মনে রেখো মানুষের কথা ॥

অত্যাচার করি

আজো অত্যাচার করো ?—করে থাকি । বাঁচবো বলে করি
কাঠ, খড়, পাথরের অভিযুক্ত অত্যাচার নেই
একসময় ছিলো হয়তো গাছ ছিলো কাঠের সূচনা
ধানের সবুজে সেই কোলাহল ছিলো
মাটি ও জলের ছিলো আলিঙ্গন, সত্তা ভুলে চূড়া
হওয়া কোনো পাহাড়ের যেখানে মানুষ, পশু আছে ।

পশুদের অত্যাচার কিছু নেই, পায়ে কাঁটা ফোটে
শূল ফোটে, রক্ত পড়ে, কাটাছেঁড়া হয় না হৃদয়
মানুষের মতো কিংবা মাঠের মতন শূন্য হাতে !

আজো অত্যাচার করো ?—করে থাকি । বাঁচবো বলে করি
কষ্ট পাও ? কষ্ট, তা কি ভোরের রোদ্দুর, বান্নাঘর ?
কষ্ট, তা কি নর্দমার দুষ্ট গন্ধ, মাছি কিংবা মশা
এতই সহজ নাকি কষ্টের কামড় ?

পথের কুকুর এসে কামড়ে যায়—কষ্ট তাকে বলে ।
তোমাকে না দেখে, দেখে কষ্ট পাই—তার মতো সুখ
জীবনে একবারও যদি পেয়ে যেতে, মুক্ত হয়ে যেতে ।

শিশুর গরম দুটি হাত এসে জড়িয়েছে গলা
স্তন দুগ্ধভাবাচ্ছন্ন, মেঘে ভরে আছে স্নিগ্ধ জল
সেই জলবিন্দু যদি চন্দনলিপির মতো মুখে
এসে পড়ে, তৃষ্ণা যায়—উড়েপুড়ে ক্লান্ত হয়ে আছি···

তাই অত্যাচার করি, করে থাকি, মরবো বলে করি ॥

নারকোল ভেঙে রাখা হয়েছে বসতির চারদিকে, চারদিকেই পাহাড়
ওই ভাঙা নারকোলের মতন—কোমরের কাছ থেকে হিম শ্যাওলা
তারপর পপলার গাছের ছবি আর ছায়া, নিচে ফার্নারি, তলপেটের
মুখোমুখি
আগুন, শিখার দাগে চামড়া কালো হয়ে গেছে, বর্ণগন্ধময় সুষমায় ওই
মারাত্মক কালো দাগ বিদেশীর ভালো লাগে ।
এমনটা তার দেশঘরে পাবার নয়, খাবারদাবার
সস্তা, সবচেয়ে সস্তা মাংস । মনে হিংসা থাকলে এখানে বেড়াতে এসো
অক্টোবর ভালো সময়, নীল আকাশ নীল জল রকমারি পাথর কুড়োবে
ছড়াবে
এ-জিনিস ফুরিয়ে যাবার নয়, যৌবন এখানে দীর্ঘজীবী, পলতের দু মুখেই
আগুন দিতে হবে শুধু । একটু মধু পেলে হতো—মধু এবং হুল
ফিতেয় বাঁধা চুল বাতাসে দুলছে, ফুল ফুটে ঝরে গেছে, ফল থইথই বাগান
মনে মেঘ জমলে এখানে বেড়াতে এসো । অক্টোবর ভালো সময়, গুজররা
নিচে নামছে, ঝাপসা ছাগল-ভেড়ার পিঠে হাঁড়িকড়া থালা বাসন, একমুখ
রাঙা চুলদাড়ি নিয়ে কোথায় কোন সমতলের সন্ন্যাসে চলেছে সারবন্দী
গুজর
পাথরের গা ঘেঁষে, ওপাশে হাঁ-করা খাদ অগাধ বিশ্রাম, খেলনা ঘরবাড়ি
শস্যের ঝকমকে পাপোশ আর কম্বল মুড়ি দেওয়া দত্যির হাড়গোড়
ভাঙতে-ভাঙতে ভাঙতে-ভাঙতে ছত্রাখান, ছড়িয়ে ছিটিয়ে
চিলচক্ষু জলে মুখ দেখছে এখন ।
মনে মেঘ জমলে এখানে বেড়াতে এসো
অক্টোবর ভালো সময়, নীল আকাশ নীল জল রকমারি পাথর
কুড়োবে ছড়াবে । এ-জিনিস ফুরিয়ে যাবার নয় :

বাড়ি করবো বলে আমি একটুকরো ইট কুড়িয়ে এনে কেনা বিঘৎখানেক
ঘাসজমির উপরে রেখে চিৎকার করে উঠলাম, এই দ্যাখো বাড়ি হলো
তৎক্ষণাৎ বাড়ি মানে আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই দাঁড়িয়ে পড়লো
বারান্দায় ডোরাকাটা রোদ্দুর বা বিকেলের মুখটায় মায়ের সেই গরদের
কাপড়
ছড়িয়ে গুটিয়ে যেতে লাগলো মধুর আর নিজের বাড়ির ওপর ঝামরে-পড়া
হাওয়া-বাতাসে
রোদ, চাল দেওয়া হলো ছড়িয়ে, বড়ির কৌটো বের হলো সারবন্দী
দেবদারুর মতন
অন্যবাড়িতে থাকা রেশম-পশম 'আছে আছে অনেক কিছু আছে' এইরকম
দাম্ভিক শব্দে
পতপত করে উড়তে লাগলো। বাসাবাড়িতে ছিলাম বলে পাখি নই
আমরা,
মানুষ বটে! মানুষ বলেই ইট পেতেছি ঘাসের ওপর—পা রাখবো বলে,
রাখবো বলে
স্থায়ী জয়স্তম্ভ, ছেলেপুলে, স্নাতকশামলায় আলুবকরা ছবি ফোটোগ্রাফ
আমার বাঁধিয়ে
আগে থেকে পেরেক কাঁচা দেয়ালে বসবে হিসেবনিকেশ, পরে বসবে না,
পরে বসবে
একটিমাত্র, আমি চলে গেলে মেজের ওপর—কাঁটাপেরেকই ভালো,
নয়তো বুক
ফেটে যাবে আমার, মরতে-মরতেও একবার চেয়ে দেখবো হয়তো ওই
আইন অমান্যকারী হাত ও কার?
এইভাবে একটি-আধটি করে শব্দের হিম আর তীব্রতাকে জঞ্জালের বাক্সে
বন্দী করে
গ্রন্থ একটি, পাতার পর পাতা মিলিয়ে যেন দরজা জানালা কানাকড়ি
দক্ষিণপুব হিসেব করতে-করতে
আমি মরতে-মরতে কোনোদিন বেঁচে উঠে এখনো তরুণ কবি, মাইরি,
মাথায় শনের নুড়ি
ভাঙা গাল তোবড়া চোয়াল বোয়াল মাছের মতন হাঁ—সামনে টাকার থলি
রঙে রঙীন কাগজ
ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এ-দরজা ও-দরজায়—তেষ্টায় ফাটছে ছাতি, যাতে
যাতি পারি তার ব্যবস্থা দ্যাকো
কই গো, কে কোতা আছো? দয়া করো—দুপুর থেকেই এই অবশ্য

জ্বালাতনে জ্বলেপুড়ে
অদ্ভুত প্রাসাদ বানাবো বলে সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে, রাস্তার ধুলোকালি
সর্বাঙ্গে মেখে
মহাদেব আমি ষাঁড়ে চড়ে এদিক-ওদিক, যেদিকে যাবার নয়
সেদিকেই…তাকে
মানুষ বলে ভুল করে, ভালোবেসে, মানুষের ভাষায় দুকথা চারকথা
শুনিয়ে, তৎক্ষণাৎ
বলে উঠি, আমার একটা বাড়ি আছে, বাড়ি মানে গ্রন্থ, গ্রন্থ মানে পাতার
পর পাতা সূক্ষ্ম অংক
মাইরি বলছি, অংকে গোল্লা পেলেও ইংরিজিতে ভালো—আচ্ছা হয়ে যাক
কুস্তি
সুস্থির থাকার উপায় নেই, একটা লাইব্রেরি ভেতরে কতো বাড়ি, কতো
প্রাসাদ ! ভাবতে-ভাবতে,
ভাবতে-ভাবতে নেশাটা জল হয়ে কলকল করে বেরিয়ে গেলো…বৃষ্টিতে
জুড়োলো কলকাতা
আর অন্ধকারে মদের দোকানের সিঁড়িতে বসে কাদের বাড়ির একটা পাগল
ভাগলপুর থেকে আনা
ছাপা বাঁধাই ভালো প্রচ্ছদপট চমৎকার এমনতরো গ্রন্থের পাতাগুলো
পানসি করে ভাসাতে থাকলো….
গঙ্গার শহর, ওপারের লোকের এপারে আসতে বড়ই অসুবিধে ॥

উপদ্রুত ঘাসের ভিতরে

এখন গভীরভাবে ঘাসের ভিতরে বসে থাকা
ভালো মনে হয়, এই প্রগাঢ় রোদ্দুরে
আকাশের নিচে থেকে থাকা নয় অথচ ছায়ায়
এই ঘাস, নদী, গাছ—এলোমেলো হাওয়ার কুহক
মনের ভিতরে কিছু গাছপালা এঁকে দেবে বলে।
এদের বলায় কোনো মিথ্যা নাই সতর্কতা নাই
মানুষের মতো নয় এরা সব একটু আলুথালু
এদের প্রকৃতি—তাই ভালো লাগে ভালোরও উপরে।

কতো কিছু পেয়েছিলে। অসুখী কপালে পোড়া হাত,
জলমগ্ন দুই চোখ বুকের উদ্ভিদ মুখচ্ছিরি—
পেয়েছিলে পথে যেন উপুড় হয়েছে কালো মেঘ
চকচকে মুদ্রা কতো পেয়েছিলে ঠোঁটের উপরে—
কিছু তার আছে নাকি? সংকেতমুখর নীল খাম।

সব গিয়ে শান্ত, থাকো উপদ্রুত ঘাসের ভিতরে॥

কেউ কি প্রকৃত ঠিক করে দিয়েছিলো ?
নাকি বাহুবলে তাকে বাগানের ভ্রূ-মধ্যে রেখেছি
এবং নিশ্চিন্ত আছি, কিছুদিন—জানি দাঁড়াবে না
পা দিয়ে চৌকাঠে যেন বলবে না, এখন তোমার
বাগানে যাবার পালা—কিছুদিন গাছ হয়ে থাকো
শিকড় যেখানে যায়, তুমি যাও—গিয়ে দেখে এসো
ঘেঁষ বালি চুন ক্ষার—মানুষের মহিমার চেয়ে
এদের দাবিও কিছু অল্প নয়, সামান্যও নয় ।
ঘরে তাই জামা পরে বসে আছে করবী কাঞ্চন
এক পাটি জুতো পায়ে সুপারি দাবায় একা খেলে
লেবুর কাঁটায় কাঁথা, মলিদা নিয়েছে ক্ষিপ্র যূঁই
অলস গোলাপ বেলি শুয়ে আছে মাথার বালিশে
ঘর ভরে গেছে মাংসে—সবুজ হলুদ নম্র নীল

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে একা আছি ॥

বাদামের গাছ থেকে স্বপ্ন নামে ভেড়ার পশমে
সবুজ ও পাকা পাতা স্বপ্ন মেখে হাওয়ায় নির্ঘাত
লুকোচুরি খেলে, ঘাসে—মাঠময়, অরণ্যের খুঁটি
উপরে বোঝায় গ্রাম এবং নিমগ্ন গেরস্থালি
কবি ও শিল্পীর, যারা সমাজের সংস্রব মানে না
ভেসে চলে, প্রগতিবিরুদ্ধ মন, আলুথালু সম্ভৃত দৈহিকে
সমর্পণ করে সব, দেখে না রগড়ে গোলা মুখ
মিছিলের : খাদ্য চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু···

কিন্তু, তা কী ক'রে পাবে সংঘ ? আমি ব্যক্তির ক্রন্দন
দেখাতে নারাজ কাউকে ; ভাড়াটে, বৃত্তিতে শোককারী
সমস্ত মানুষ নয়, হতে পারে মার্কসীয় দর্শনে !
অধিকন্তু, হওয়া শক্ত, হওয়া ভুল ; দেখেছি দৈবাৎ
একটি মিছিল যেন একদিন মিলেছে সন্দেহে···
মানুষের মধ্যে খুবই টুকরো টুকরো অসংখ্য মানুষ ॥

দুটি কবিতা

আমার শেষ গাড়ি

হলো না কাড়াকাড়ি
আমি নিলাম মাঠের বাসা, তুমি আমার বাড়ি
যখন নিলে বাগান গোলাঘর
আমি নিলাম আমারি অন্তর
চেতনা হলো শেষে
তোমায় ভালো অধিকতর বেসে
ছিলো না তাড়াতাড়ি
তোমার আগে কিভাবে যাবে আমার শেষ গাড়ি ?

চাঁদের ভিতরে

চাঁদের ভিতরে কতকাল
পড়ে আছে তোমার কঙ্কাল
তুমি গেছো মরে
তাই তার আবছায়া দেখি আমি মেঘের ভিতরে ।
আজো স্পষ্ট দেখেছি তোমায়
তখন হঠাৎ বেলা যায়
সন্ধ্যা নেমে আসে
কোমল সুরভি তবু ভেসে থাকে দেহের বাতাসে ।

আমাদের নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন ছিলো

আমাদের স্বপ্ন আপেলের গুচ্ছ গুচ্ছ মূলের মতো সোনালী ছিলো ।
তোমাদের সাম্রাজ্যবাদী
কেশর মোচন করো, হায় চীন ! তোমাদের গাছের পাতার রঙ আমাদের
গাছের পাতার রঙেরই মতো । তোমাদের নারীদের মতোই আমাদের
নারীদের দেশপ্রেমিক দেহমন ।
তোমাদের সাহিত্যের মতো আমাদের সাহিত্যের সরাসরি
নির্বাচনহীন ভালোবাসা ছিলো । আজ তোমাদের প্রতি তোমাদের
নারীদেরও ভালোবাসা নেই কামনা করবো,
তোমাদের মতন মানুষের প্রতি ভালোবাসামূলক সাহিত্য
আজ থেকে আমরা আর লিখব না । আমরা ভালোবাসতে পারবো না,
তোমাদের দেশের কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ ।
আমরা বাঘের শিশুরও মুখচুম্বন করতে ভয় পাবো ।
আমরা সাপের মতো নোংরা ও অবিশ্বাসপ্রধান তোমাদের কাঁধে
কোনোদিন আর হাত দিয়ে দেখবো না তুষার ।
আমরা এমন হিংস্রভাবে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়াবো
যেরকমভাবে মানুষ কখনো পৃথিবীতে দাঁড়ায়নি
কেননা পৃথিবীর এই অত্যুজ্জ্বল সুসময়ে তোমরা জানোয়ারের মতো,
মানুষের আত্মা ও অস্তিত্ব ও মহত্ত্বের উপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছো !
তোমাদের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে এত বড় হিংস্রতা কোথায় লুকিয়ে
ছিলো ?
তোমাদের ভাবলেশহীন মুখে-চোখে এত বড় হিংস্রতা কোথায় লুকিয়ে
ছিলো ?
তোমাদের মহিলাদের রমণীদের মুখে এত বড় হিংস্রতা গোপন ছিলো
কোথায় ?
আমরা বুঝতে চাইনি কোনোদিন, কেননা, পৃথিবীর অত্যুজ্জ্বল সময় এখন
নোংরামি করার দিন নয় এখন, হিংসা করার দিন নয় এখন । আমাদের
নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন আপেলের গুচ্ছ গুচ্ছ মূলের মতো সোনালী
ছিলো ।

পাখি

বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই, আপাতত পৃথিবী নীরব ।
জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা,
দেয়ালে বিরস, নীল গলিত গন্ধের স্রোত, শব
ছুঁয়ে আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা ।

আর কেউ পাশে নেই ; বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই···ঘরে—
ভালোবাসা নেই তার । সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝরে ঝরে
উজ্জ্বল পাখিরা সব একদিন উড়ে গেল পরে···
বৃষ্টি এলো, হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে ।

অর্বাচীন নায়িকা

অঙ্গেতে চন্দনগন্ধ, কণ্ঠে শোভে নীল চন্দ্রহার,
মৃণাল বলয়ে যুগ্ম স্বর্ণবিছা, অঙ্গুরী হীরকে
বাঁধে সে সম্মানমূল্য, হংসীর গমনে দোলে তার
অঙ্গার আকুল কেশ, দৃষ্টি দূর স্নিগ্ধ কুরুবকে ।

প্রাচীন রূপসী চলে বিলাসিনী নদীর নিকটে
চরণমঞ্জীরে বাজে চঞ্চল জলের মিষ্টস্বর,
কে যেন চতুর চোর অশ্ব বাঁধা পিতামহ বটে ;
এ সকল নাট্যে কিম্বা পৌরাণিক যুগে আনতো দর ।

এখন শিল্পের মাটি পরেছে অক্ষম নীলশিরা
যুক্তির বা নায়িকার মুখ ভ'রে অঙ্কের মতন
চেক্ চেক্ ঢেরা কাটা, ক্যাম্প, কুস্তি ক'রে বাসে চড়া—
মা নিয়ে নবতি পোষ্য, ইলেক্শন, সুস্থ শিরঃপীড়া
কেবল অন্নের জন্য । প্রেম আহা, উজ্জ্বল স্টেশন
দূরে নিয়ে চলে মনকে, কাঁখে জ্বলে সংসারের ঘড়া ॥

পার্শ্ব চরিত্র

অরণ্যের মত তোর নোটন পায়রাকে ঢেকে রাখি ।

অন্ধকার জলে দুটি বাহু ফেরে মাছের মতন,
হিংস্র শীতল হাসি শৃগালের মুখ থেকে গলে
কাঁপায় সর্বত্র শান্তি । পরিতৃপ্ত রাত্রেও পাগলে
অঙ্ক কষে নাজেহাল । আমি তোর চন্দনের বন
পার হতে পরাজিত, ফিরেছি যৌবন বেচে হাটে
উদাস হওয়ার মত কণ্ঠে এক ক্লান্তির তামাটে
মাদুলিতে রক্ষা করি নাম-ধাম অন্ধকার মেঘে
বিপন্ন পাখির মত ফিরি তোর যন্ত্রণায় জেগে ।

সারাদিন ধান খুঁটি, ফিরে আসি সন্ধ্যাবেলা ঘরে ।
জানলার শার্সিতে একা শালিখ হাজার বার নড়ে ;
পায়ে পায়ে পার্কে আসি মুখ তার হেমন্তের বেলা
অন্তিম রোদের রেণু মেখে নিয়ে দুষ্টু যত খেলা
নিজহাতে ভেঙে দেয় পুষ্পহারে বাঁধা কারো খোঁপা,
মাছরাঙা শাড়িতে ঢেকে রাধাচূড়া গাছের ছায়ায়
মেয়েটি দুরন্ত ঝড় রক্ষা করে, মনে বড়ো বোকা
সঙ্গের যুবক বন্ধু, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ঠায়
কোথায় কি ভ্রান্তি আছে চঞ্চল জলের মত স্বরে
অনর্গল কথা কয় । আমি সেই মৃত্যুর বিবরে
ধুলোর ছোঁয়ায় অন্ধ, পাখাপোড়া কান্নার জোনাকি ।
অরণ্যে বাতাসে তোর নোটন পায়রাকে তুলে রাখি ॥

বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল

নষ্ট কিছু ফল পড়ে মাটিতে গড়ায়।
নিজে নয়, নিজে ও তো গড়াতে পারে না।
কিছু পিপড়ে টেনে নিয়ে যায় ওকে খন্দে ফেলে দিতে—
ফেলে দেয়, ও কিছু বলে না।

বলার নেই, ওর শুধু নষ্ট চেয়ে থাকা,
চেয়ে-চেয়ে কিছু বলা, নষ্ট কিছু বলা।
ফলের বদলে ঐ খন্দ কথা বলে !
জল আছে, জল কিছু বলে—
কাদা আছে, কাদা কিছু বলে !

নষ্ট কিছু ফল পড়ে মাটিতে গড়ায়—
দুর্ভাগার দিনকাল শেষ, তাই মাটিতে গড়ায়.
কিছু পিপড়ে টেনে নিয়ে যায় ওকে খন্দে ফেলে দিতে—
বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল, একদিনই ছিলো।

শেষ হবে, এভাবেই হয়

বহুক্ষণ আগে জ্বালিয়েছি
এবার প্রকৃত নিভে যাবে
উড়ে-পুড়ে দূরে যাবে ছাই
হয়তো সমস্ত বাসনাই
শেষ হবে ।
এভাবেই হয়
কাঠে ঘুণ লাগে, লাগে ক্ষয়
তবে, বুঝি এভাবেই হয় !
কখনো কখনো অন্যভাবে
পা টেনে গা টেনে দিন যাবে
যেভাবেই যাক
পুড়ে খাক
হবে একদিনই ।
তারপর বলতে আছে কিছু ?
লোকটির নিকটে সব মিছু
লোকটির নিকটে সবই মিছু ।

স্বপ্নের ভিতরে একই মুখ

স্বপ্নের ভিতরে কেন একই মুখ নড়াচড়া করে ?

তবে কি আমার কাঠে শাদাপিঁপড়ে করেছে জটলা—
ঘুণপোকা গুণছুঁচ দাঁতে ফোঁড়ে ক্ষত ও বিক্ষত
মেধা, দেহকোষ আর ঝাঁঝরা করে বুকের কপাট
হাট বসে গেছে এই কাঠের চালুনি দেখতে, মেয়ে !

স্বপ্নের ভিতরে আজই একমুখ নড়াচড়া করে—
কেন ? তাকি জানা যায় ? অন্তত একাংশ জানা গেলে
পরবর্তী তৈরি করে নেওয়া যেতো বিশ্লেষণ দিয়ে—
ছোবল কোথায় শুরু, বিষস্রোত ধমনী-ধারায়,
কী খাতে বহতা আর কোন্ অংশে সমুদ্রের গতি ।
এইসব দেখেশুনে স্বপ্নের ভিতরে মুখগুলি,
পুরাতন মুখগুলি একই বৃত্তে ঘোরাফেরা করে ।
মন-মন কাজে ঝাঁঝরা করে দেয় মানুষের কাঠ—
করিৎকর্মার দল, জানে না হৃদয় কোথা আছে
লুকোনো, গুদামঘরে চাবি ও কুলুপ ছাড়া একা,
শীততাপনিয়ন্ত্রিত হৃদয় এখনো বেঁচে আছে !

অদরকার প্রত্যেকে জানানো…
স্বপ্নের ভিতরে সেই মুখ আজো ঘোরাফেরা করে ।
গুদামের সামনে এলে কিছুতেই ফেরানো যেতো না
তাকে, ভাগ্যে, আসেনি সে । না, আমার শান্ত বিবেচনা !

সাগরের হাওয়া গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে, এখানে
গাছপালায় অদ্ভুত শব্দ, ঘাসে গন্ধ মাখা ধুলো, এখানে
তুলোর চাষ হবে বলেছিলে একদিন, দুপুরের দিকে, হাতে
মাথা রেখে, মাদুরে চিৎ, এখানে বাড়ি করতে ভিত লাগে না
এক পশলা বৃষ্টিতেই জম্পেশ শীত পড়ে
এখানে হাওয়া লাগলে পাতা নড়ে, কী আশ্চর্য !
এখানে সবকিছুই
কেমন অন্যধরনের আলাদা ধরনের, এখানে হেঁটে সবাই রাস্তা
পার হয়, ধার করলে ধার হয় না, পাওনা থাকে, এখানে
একজনও অন্যজনের মতো দেখতে নয়, ভয় নেই এখানে
সাহস এখানে একটুকরো কানি বেঁধে আকাশে ওড়ায়
গোড়ায় বলে রাখা ভালো, এখানে
কালো মানেই শাদা, এখানে গাধা মানেই গরু
সরু সরু গলি পড়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায়, এখানে
ভালোবাসা বলে কিচ্ছু নেই, একধরনের মিচ্ছু টান
আছে, ঘরের কাছেই শ্মশান, দেরি হবে না পুড়তে
উড়তে ইচ্ছেই যথেষ্ট, ডানার দরকার নেই, একটু
তালকানা ভাব থাকলেই চলবে, কথা বলবে ঝুঁকে, এখানে
মনেমুখে এক নয়, ভয় নেই এখানে, যখন যেখানে
যাবার দরকার, সহজেই যাওয়া যায়, এখানের সবই
কেমন একটু অন্যধরনের, আলাদা ধরনের, এখানে
বৃষ্টি পড়লেই লোকে মাঠে বেরোয়, রাত্রে পথে.
দিনের বেলা মানুষে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, এখানে
ফানুস ওড়ে, দিনরাত্তির ফানুস উড়ে বেড়ায়
কিচ্ছু করার নেই মানুষের, এখানের
সবটাই কেমন একটু অন্যধরনের, আলাদা ধরনের ।

ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে

বহুবার হারিয়েছে ব'লে আজ কেউ
লোকটিকে খোঁজে না আর, সুতো ছাড়তে থাকে
যতো দূর যেতে চায়, যাক, বেঁচে থাক।
অমৃত্যু মাথার 'পরে মুকুট দিয়েছে—
অনেকেই চেনে তাকে, অনেকে চেনে না।
বোঝে কিছু, বোঝে মিছু কোনো কোনো লোক,
কিছুই লাগে-না-ভালো এমন অসুখে
লোকটি উচ্ছন্ন আজ, বেঁচে-বর্তে আছে
কোনো মতে। বেঁচে থাক, দুঃখী হয়ে থাক।
কিন্তু, কী যে দুঃখ তার নিজেই জানে না,
লোকটি কবি, ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়!

সুড়ঙ্গ কোথায় যাবে ?

কথা ছিল ভালোবেসে-বেসে কিছু সুড়ঙ্গ বানাব ।

একমুখ লুকিয়ে থাকবে গাছের শিকড়ে,
পাতাপুতা উইঢিবি দিয়ে সন্তর্পণে
ঢাকবো বিচ্ছিরি মুখ, ডালপালা দেবো ।
পদচ্ছাপ মুখে ফিরে আসবো বাড়িঘরে,
যেন আলাভোলা শিশু, মুখে চুষিকাঠি
নালে-নালে বুক ভেজা, অশ্রুপাতে নয় !

সুড়ঙ্গ কোথায় যাবে ? কার কাছে যাবে ?

দেখেছো কি কুঁচমাছ জলের ভিতরে ?
গর্তে, আধো জেগে ঠায় কেন বসে থাকে ?
দোল খায়, যেন গায়ে বাতাস লেগেছে
জলের নিজস্ব হাওয়া, নিজ অভিমান !

বিছানা পাওয়ার মতো, স্বচ্ছন্দ গর্তের
ভিতরে ঢুকেছি আমি, সুড়ঙ্গ কেটেছি—
কারুর পালঙ্কতলে, কারো হিমবুকে
কারো করতল খুঁড়ে গিয়েছি চিবুকে
পায়ে পায়ে, শব্দ নয়, ঘুম ভেঙে যাবে !

ঘুমের ভিতরে কাঁচা পানের বরজ
অনেক দেখেছি আমি, উড়োপুড়ো ঘর
দেখেছি যথেষ্ট, আরো দেখতে পাবো বলে
চলেছি সুড়ঙ্গ কেটে কুঁচের মতন···

সুড়ঙ্গ কোথায় যাবে ? কার কাছে যাবে ?

হাহাকারে ফেলে তাকে, পাখি উড়ে গেছে
গাছের নিজস্ব নয়, শকুনের দল !
এখন গাছটি আছে ডালপালা সম্বল,
পাতাপুতাহীন গাছ শ্মশান হয়েছে ।
শ্মশানের মতো উদাসীনতায় নয়,
বেঁচে-বর্তে না থাকার ঘোরতর ভয়
গাছের সর্বত্র, জানি, শিকড়েও ঘুণ
লেগেছে, লেগেই আছে, সাদর সংশ্লেষে !

থাক হাহাকার, পাখি উড়ে গেছে, যাক ।
অন্তত সুকাল ফিরে আসার প্রত্যাশা
বেঁচে থাক, গাঁটে-জোড়ে, কাঠের অন্তরে ।
ধীর উচ্চারণময় বাসন্তী মন্তরে
হয়তো উঠবে জেগে, হিমঘুম থেকে,
পল্লবে-পল্লবে ছেয়ে যাবে বাহু দুটি
গাছের, কাছের জলপ্রান্তের ডাহুকী
দেবে ডাক, আছে থাক, ও অনন্যমনা ॥

খৈরী, আমার খৈরী : একটি এলেজি

হলুদ রোদ্দুরে-মোড়া দেহ জুড়ে কালসিটে দাগ
ছায়ার চাবুক খেয়ে এই রূপ ভারি আদরের
হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, জলে ও জঙ্গলে ভয়ংকরী...
মানুষের ঘরে-দোরে অনায়াসে ঘোরো-ফেরো কন্যার মতন
মানুষী মায়ের গায়ে পা তুলে শুয়েছো তুমি
ভরসন্ধেবেলা

এ সবই দেখছি আমি, তক্তপোশে শুয়ে
আমার মেয়ের হাত থেকে খেতে কাঁচা রাং দুধে মেখে দিলে
খেয়ে ফলি-কাৎ মেরে শুয়ে থাকতে আকাশের নিচে
আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ, খয়া ও খর্বুটে চাঁদ, জঙ্গলে ডেকেছে...
মানুষের ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যাবে না ?
জঙ্গলই তোমার ঘর, জঙ্গলে যাবে না ?

যাবো, জঙ্গলেও যাবো, পারে, পরবাসে
একদিন ।
আজ নয়, আজ বড়ো ভিক্ষা-পরবশ এই দেহ এই মন
জঙ্গল করেছে বিসর্জন
দুধের শিশুকে কেন মা-বাঘ দিয়েছে বিসর্জন একদিন !

অভিমান আমায় করেছে পর-বশ
কন্যার মতন স্নেহে পরিযত্নে থাকি
মানুষের ভালোবাসা, ঘৃণা নয়, কী জব্দ করেছে
ছেড়ে রেখে বেঁধেছে শৃঙ্খলে !
মানুষই এভাবে বাঁধে. ভালোবেসে, ঘৃণা করে নয় ।

নিষ্ঠুর হায়নার সঙ্গে অন্ধ আমি তোমাকেই খুঁজি
বাংলোর বাগানে নেই, ঝরা পাতা আছে
সদরে-অন্দরে নেই, শূন্যতার কাছে
আত্মসমর্পণ করে বসে আছে দুজন পাথর
মানুষ পাথর হয় বাঘিনীর শোকে
কোথাও শুনেছো ?
খৈরী, আমার খৈরী, স্বর্গের বাগানে
প্রকৃত দেবতা নয়, মানুষকেই খোঁজে !

চতুর্দশী

এখন, শেষের দিনে, কোনোদিনও নির্বোধ করে না
বিবাদ । মানুষ, তুমি ভুলে যাও, অত্যাগসহন,
ছেড়ে দাও ওর কটুকাটব্য কবিতা লক্ষ্য ক'রে…
ও ছিলো পাথরে-জলে ম্রিয়মাণ দেবতার মতো

ক্ষমা করে দাও ওকে, শাস্তি দাও, কেননা এখনই
চলে যাবে, মুক্তি দাও, ওর ঘনবন্ধন চারদিকে…
তুমি তো পাথর জল কিছু নও, ও যজ্ঞডুমুর
তুমি তো পাথর জল কিছু নও, ও যজ্ঞডুমুর

সুতো ধরে এসেছিলো ভুলভুলায়, সুতো ধরে গেছে !
ভিতরে জীবন ছিলো, পুষেছিলো পাখি ও প্রতন
একদিন, মানুষের মতো, শুধু চিতা বলে গেছে…
ওই একটি শব্দ ছিলো অহরহ অত্যাগসহন
চতুর্দশী চাঁদ, তুমি, কথা দাও, করো না বঞ্চনা…
ভালোবাসা, ভিক্ষা পেতে ওর বড় পরিশ্রম হলো !

এইভাবে

কলকাতার উপকণ্ঠে শুয়ে আছি যেন অবসৃত,
মানুষের মূর্তি হয়ে শুয়ে আছি যেন অবসৃত,
জঙ্গলের মেহগিনি, দামী, অতিমূল্যবান গাছ ।

শুয়ে শুয়ে মেঘ দেখি জানলার লোহা-ফ্রেমে আঁটা ।
অন্তরালবর্তী পর্দা মেঘ দেখলে দুহাতে সরিয়ে
দিই আমি, শুয়ে থাকি মূল্যবান মেহগিনি গাছ ।

প্রান্তে টেবিলের 'পরে শিশিভর্তি যমুনোত্রী মদ,
পাশের গেলাসে ঢালা রক্তের মতন তীব্রতার
জীবনদায়িনী উষ্মা, ছাইদানি, সিগারেট, দেশলাই ।

একজীবন কাজ করেছি, এখন কাজের থেকে ছুটি ।
আজ কষ্টকর গদ্য নয়, কিছু পদ্যের মোহর
ছড়াই জানালা গলে বাগিচার ভিতরে ও ঘাসে ।

এইভাবে বেঁচে-থাকা জীবনের কয়েকটি বছর—
নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিয়ে, ভালোবেসে, মরে যেতে পারি ।

এমন অসুখে

যৎসামান্য পথ্য দিও আমার অসুখে !
নতুন বাড়িতে দিও একটি ছোটো ঘর,
কাগজে বোঝাই হোক, বইপত্রে ঠাসা,
যৎসামান্য পথ্য দিও আমার অসুখে ।
থাকবে যথেষ্ট মদ্য, কিছু পদ্য আর সিগারেট
মনে হলে খেতে পারি, এমনি উচিত স্বাধীনতা—
ভোগ করবো যে কদিন বেঁচে থাকবো সেই ছোট ঘরে ।
বিকেলে নিজেকে টেনে নিয়ে আসবো ঘরের বাইরে—
যেখানে ফুটন্ত ফুল, সবুজাভ ঘাস,
চারিদিক খুঁটে তুলবে হিংস্র কৃষ্ণচূড়া,
স্মৃতিটিলা খুঁড়ে তুলবে নম্র শেফালিকা,
বেছে বেছে কাছে ডাকবো সুজন-স্বজনে,
যৎসামান্য পথ্য চাই এমন অসুখে !

লিডারের পাশে শুয়ে আছি

পহেলগাঁও উপত্যকা, লিডারের পাশে শুয়ে আছি,
চলে জল ছলোচ্ছল, মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয়,
ঘাসের উপরে পড়ে সেই শিলা বরফের মতো
শাদা, অপ্রগল্‌ভ আর সবুজাভ হিমসম্প্রপাতে ।
বাঘের শীতের মতো মাঘের হিমানী এই দেশে
উপত্যকা জুড়ে আছে গল্‌ফ-কোর্স, মন্দির, মসজিদ—
পহেলগাঁও উপত্যকা, লিডারের পাশে শুয়ে আছি,
চলে জল ছলোচ্ছল, মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হয় ।

বিশ্রামের মধ্যে থাকে অসংখ্য স্বপ্নের চলাচল—
কষ্টকর স্বপ্ন নয়, অনায়াস, বিলাসবহুল :
ক্যাম্প খাট, রুটিমাংস, রকমারি স্কচের ফোয়ারা—
জানলা দিয়ে দেখা যায় ট্রাউট-ফিসিং করে যুবা ;
ভাবনা হয় ঘরে গিয়ে কোন্ দৃশ্যে এ-দৃশ্য মেলাবো ?
ক্যাম্প করে রাত্রিবাস করে দেখবো আমার উঠোনে ।

সফদর হাশমি

বুকের ভাষা মুখ দিয়ে বের করার জন্যে
ওরা তোমায় খুন করেছে !
আরো অনেক রক্ত চাইছে ভারতবর্ষ ।
খাল নদী বিল ভরাট করবে ভারতবর্ষ,
তোমার মতন স্পষ্টভাষীর রক্ত দিয়ে—
গাছের গোড়ায় সার দেবে এই ভারতবর্ষ !
হাশমি হাশমি
তোমার মতন সহজে আর প্রাণ দেবো না,
যতোই চাক না ভারতবর্ষ ।

এখনো নামেনি বৃষ্টি

এখনো নামেনি বৃষ্টি, বৈশাখের শেষ দেখা পাই,
ময়দানের ঘাস ছিঁড়ে ঝড় ঢুকবে আনন্দবাজারে—
কোথা সে-বিকেলবেলা ? অস্ত্রের মতন করুগেট,
কোথায় সে ধূলিঝড়, তামাটে আকাশ, রাগী শিখা
বিদ্যুতের, বাঁকাচোরা ছোবল, সংশ্লিষ্ট বাজপাত ?
কোথায় করাতকল ; কাঠুরে, কোঁদল, উলুধ্বনি—
শিলার সন্ত্রাস কই শেফালির মতো ঝরে ঘাসে,
অদূর লেলিহ শিখা ওঠে কই ঝড়ের ঝাপটায় ?

ও নূতন বাড়ি

পলেস্তরাহীন বাড়ি, তবুও সুন্দর !
আলো-র ম্যুরাল ঘরে, বাহিরে ম্যুরাল ।
অগোছালো ঘরে তার স্বেদ পড়ে আছে,
প্রকল্পের ছেনি ধরে প্রধান মিস্তিরি !
সপ্তাহের শেষে যাই, সপ্তাহান্তে ফিরি
পুরনো বাড়িতে. যার ফেটে গেছে ছাদ,
মেরামত করতে হয় বছরে-বছরে—
নূতন বাড়িতে নেই সেই মেরামতি ।
সেখানে কেবল গড়া, এখানে বর্জন
নূতন বাড়িতে গেলে আমি বদলে যাবো
পঞ্চাশ হয়েছি পার, পঞ্চাশ বছর
আমি বাসতে চাই ভালো, ও নূতন বাড়ি !

আসবো ব'লে চলে গেলে, আগামী সপ্তাহে
আসবো,এসে বসে করবো ব্রেকের তর্জমা !
বুঝি না কী ভাবছো তুমি অসুস্থ শরীরে,
আজই যদি কাছে যাই, পাবো নাকি ক্ষমা ?
ক্ষমা পাবো, চেয়ে থাকবো মুগ্ধ কিছুক্ষণ,
তোমার মুখের দিকে স্বপ্নস্বরূপিণী—
ধীর পায়ে অভিমান যাবে মুখ থেকে
আমি তার দীর্ঘশ্বাস শুনবো পদধ্বনি ।
প্রেমের পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে আজ ।
স্কুলের কাজের কথা অনর্গল বলা,
তর্জমার ফাঁকে ফাঁকে চলে বহ্নিপান,
তুমি চেয়ে থাকো শুধু পোড়া মুখপানে ।
কেমন সহজে কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে
বলো, আমি মুগ্ধ চোখে দেখি তব মুখ,
এখনো মুগ্ধতা আসে, অন্ধকার জ্বলে !

যাবার সময় হলো

জীবনযাপনে কিছু ঢিলেঢালা ভাব এসে গেছে।
চেতনার ক্ষিপ্র কাজ এখন তেমন ক্ষিপ্র নয়—
কেমন আলস্যে আমি শুয়ে থাকি, আর দেখি চাঁদ,
বাঘের মুড়োর মতো চাঁদ পড়ে আমার বাগানে।
আমার ক্ষিপ্রতা গেছে, তার সঙ্গে গেছে হিংসা লোভ,
কবি হয়ে দাঁড়াবার আর কোনো সাধ নেই মনে।
শেষ হয়ে গেছে লোকটা, এও শুনে লাগে না আঁচড়
গায়ে, সব শুনে শুই পাশ ফিরে সম্ভ্রান্ত বিশ্রামে।
গতরাতে শেষকরা পদ্যটির তুমুল উত্তাপ
এখন পারি না দিতে সভাঘরে, বিশিষ্ট শ্রোতাকে।
পুরনো প্রাক্তন লেখা সেকালীন দুর্গন্ধে জড়ানো—
সেইসব পাঠ করে কোনোমতে আত্মতৃপ্তি পাই!
সুতরাং ভালো নেই, পরিপার্শ্ব চাপ তৈরি করে—
যাবার সময় হলো, নেভার আগেই ভালো যাওয়া।
